অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন: বহি:স্থ ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ*

১

এ মাস বিজয়ের মাস। আর তিন দিন পর ষোলই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস, সাইত্রিশতম বিজয় দিবস। আসন্ন মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টি করা হবে, সকলেরই আর্থ-সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত হবে। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জন দীর্ঘ ৩৬ বছর পরও সুদূর পরাহত থেকে গেল।

দেশে অবশ্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে উল্লেখযোগ্যহারে। বিগত ১৩/১৪ বছর যাবত বছরে গড়ে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ হারে কিন্তু সেই সঙ্গে আয় বৈষম্যও বেড়েছে প্রকটভাবে। অধিকাংশ মানুষ ন্যায্যভাবে সেই জাতীয় আয়-বৃদ্ধিতে অংশীদার হতে পারেন নি, আর এক-তৃতীয়াংশতো থেকে গেছেন একেবারেই বঞ্চিত, হতদরিদ্র। আয়-দারিদ্র্যই সব কথা নয়, দারিদ্র্যের বিভিন্ন আঙ্গিক এবং ধরন রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়:নিষ্কাশন, সামাজিক ন্যায় বিচার, আইনের শাসন, কর্মসংস্থানসহ সকলক্ষেত্রেই দেশে ব্যাপক মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ের ঘাটতির ও বৈষম্যের শিকার। অবশ্যই দরিদ্রতম এক-তৃতীয়াংশ সকল বিবেচনায় মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

২

উন্নয়নের সুফল ন্যায্যভাবে সকলের কাছে পৌঁছা জরুরি, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এই মত অহরহ উচ্চারিত হতে শোনা যায়— যারা সমাজের উপর তলায় রয়েছেন তাদের প্রায় সবার কাছ থেকেই। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কেন সেই পথে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। অনেককে বলতে শোনা যায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকাই এর প্রধান কারণ। অবশ্যই এটি একটি কারণ। অত:পর, রাজনৈতিক সদিচ্ছা কেন নেই সেই প্রশ্ন অবধারিতভাবে চলে আসে সামনে। প্রথমত বাংলাদেশে জনকেন্দ্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি এযাবত শুরুই হয়নি। এছাড়া যারা রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতাবান তাদের ব্যাপক অংশ সমাজের অন্যান্য ক্ষমতাবান অংশের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যোগশাজসে যে লিপ্ত ছিলেন তা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান থেকে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে। দুর্নীতি যে কত ব্যাপক তার স্বরূপ দেখা গেছে দুর্নীতির অভিযোগে আটককৃত অনেকের স্বীকারোক্তি থেকে এবং বিভিন্ন অনুসন্ধানী গবেষণা এবং পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের রিপোর্ট থেকে। যা কিছু প্রবৃদ্ধি এদেশে ঘটেছে তার সিংহভাগই দুর্নীতি ও ক্ষমতার দাপটে কুক্ষিগত করে নিয়েছে প্রতাপশালী বিভিন্ন গোষ্ঠী। আমি আশা করব যথাযথ বিচারের

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

মাধ্যমে যারা দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রমাণিত হবেন তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধান করে এমন উদাহরণ স্থাপন করা হবে যাতে ভবিষ্যতে এই পথ অনেকে পরিহার করবেন। তবে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। আমি আশা করব, কথিত দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আটক করা হয়েছে বা আটক করা হবে তাদের মধ্যে সুপরিচিত ও বহুল আলোচিত মহানায়কদের বিচার যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করা হবে। এটি করা হলে দেশ ও জাতি খুবই উপকৃত হতে পারে। অবশ্যই শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রও যাদের এহেন পরিচিতি রয়েছে তাদেরকেও একইভাবে বিচার প্রক্রিয়ার অধীনে আনা নিশ্চিত করা চাই।

অর্থনীতিতে অস্থিরতা দূর করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী মহলকে আশ্বস্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত Better Business Forum প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসাবাণিজ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা এবং গতিশীলতা সঞ্চার করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। এই ফোরামের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা যেগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা বাস্তবায়ন করবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছার প্রতিফলন ফোরামের কর্মকাণ্ডে ঘটলে এবং সেই আলোকে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত হলে এই উদ্যোগ থেকে ভাল ফল পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

তবে দেশের সার্বিক অগ্রগতির প্রয়োজনে, সার্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নতি জরুরি। সেই আঙ্গিকে একটি বিষয় সামনে এসে যায়। জাতীয় অগ্রগতির মূল ভিত্তি যে সক্ষম মানুষ তাদের সৃজনে যাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য তারা হচ্ছেন শিক্ষক, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অস্থিরতা দেশে শিক্ষার ওপর অপরিমেয় বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই এক্ষেত্রে, সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ অনুসরণ করলে তা সুস্থ রাজনৈতিক-সামাজিক প্রক্রিয়া গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

৩

১১ জানুয়ারি ২০০৭ একটি রক্তক্ষয়ী সর্বনাশের দিকে ধাবিত দেশকে উদ্ধার করেছে ওই পরিণতি থেকে। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই জাতির অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবিদার। পরবর্তীতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় স্বার্থে যে সকল গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, এবং নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের পুনর্গঠন। যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রগতি হয়নি বরং সমস্যা প্রকটতর হয়েছে তা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতি।

আর এই সরকারের মূল দায়িত্ব সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ২০০৮ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হবে এবং দেশ সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা সকলেরই। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হলে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের উন্নতির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপন করবে। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে সাফল্য জাতির এগিয়ে চলার পথে একটা জানালা খুলে দিবে। কিন্তু পথ অনেক বাকি থাকবে। তবে কারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাদের উপর নির্ভর করবে তৎপরবর্তী পথপরিক্রমার চালচিত্র যা নির্ধারণ করবে দেশে সুস্থ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশের পথ সৃষ্টি হবে, নাকি হবে না।

এই পথপরিক্রমার লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি যেখানে শ্রেণী-গোষ্ঠী-নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনে ন্যায্যভাবে অংশীদার হবেন। এই পথপরিক্রমায় দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে নানা ঝুঁকি। ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে উত্তরণের যথাযথ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং সম্ভাবনাগুলোর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সমন্বিত করে মূল লক্ষ্যগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে হলে একটি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রয়োজন।

দেশে বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে এই পথে এগিয়ে চলার রূপরেখা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় সেদিকে আলোকপাত করার আগে দেশের বর্তমান বাস্তবতা সামনে নিয়ে আসার জন্য বর্তমানে দেশে দারিদ্র্য কোন পর্যায়ে আছে সে সম্বন্ধে দু-একটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ৩৬ শতাংশ মানুষ অতি দরিদ্র যারা দৈনিক মাথাপিছু পিপিপি এক ডলার বা ১৬ থেকে ১৮ টাকার কম আয় দিয়ে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন আর ৮৩ শতাংশ মানুষকে দৈনিক মাথাপিছু পিপিপি দুই ডলার বা ৩২ থেকে ৩৬ টাকার কম আয়ে জীবন-যাপন করতে হয়। এই তথ্যই সর্বশেষ-প্রাপ্ত এবং তা ২০০০ সালের। বিগত কয়েক বছরে অনুপাত দু'টি কিছু কমলেও বাস্তবতার আলোকে বলা যায় তেমন উন্নতি ঘটেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ এবং ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষিতে দৈনিক ৩৬ টাকায় একজনের জীবন-যাপন করা দুর্দশারই নামান্তর আর ১৬ বা ১৮ টাকায় যাদের জীবন যাপন করতে হয় তারা তো জীবন্মৃতই। কাজেই বাংলাদেশে এক বিশাল জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে অংশীদারিত্বহীন। শিক্ষা-দীক্ষা, প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক বিকাশ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কোনো কিছুতেই তাদের কার্যকর অংশীদারিত্ব নেই। এদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছেন বেকার, আধা বেকার, কৃষি শ্রমিক, প্রান্তিক চাষী, প্রতিবন্ধী এবং বিভিন্ন পেশার প্রান্তজনেরা। এসকল মানুষকে পরিসংখ্যানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, জলজ্যান্ত সম্পূর্ণ মানবাধিকার-সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নয়। মানব-মর্যাদার বিচারে তারা অপাংক্তেও, আর তাদেরই শ্রমে কৃষি শিল্প ও অন্যান্য খাতে যে মুনাফা অর্জিত হয়, যে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ঘটে তার সিংহভাগ চলে যায় একটি ছোট্ট ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর কাছে। এই অবস্থা থেকে অংশীদারিত্ব-ভিত্তিক বিকাশ ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য বিরাজমান বাস্তবতার ভিত্তিতে একটি কাঠামোর মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আর এই কাঠামোর মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে থাকবে নিম্নোক্ত চারটি:

ক্ষুধা-দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচার, এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি। এই মুক্তির জন্য অবশ্যই প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে সক্ষমতার বিকাশ আর সে জন্য জোর দিতে হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবায় এবং সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নে। এই সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে ঘাটতি বিশাল। এসকল ক্ষেত্রে ঘাটতি মেটাতে সরকারকেই মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই প্রয়োজন। দারিদ্র্য নিরসনে একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়লেই দারিদ্র্য হ্রাস পায় না। সেজন্য চাই অর্জিত প্রবৃদ্ধির সুবন্টন। কাজেই দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সুবন্টিত বা ন্যায্যভাবে বন্টিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এক্ষেত্রে উন্নয়ননীতি ও বিনিয়োগের গণমুখী পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। পরিবেশগত ও অন্যান্য বাস্তবতার প্রেক্ষিতে গবেষণার ভিত্তিতে কৃষিখাতে সংস্কার ও খাতটির বহুমুখীকরণে জোর দিতে হবে। অবকাঠামো তৈরি করে এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও সহায়তা দিয়ে গ্রামীণ অকৃষিখাত, দেশব্যাপী ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ

উৎসাহিত করা চাই। কেননা এ সকল খাতে সাধারণ মানুষ উদ্যোক্তা বা শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে সম্পৃক্ত হতে পারেন। বেকার ও আধাবেকার মানুষ উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হলে একদিকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমবে, আর অপরদিকে জাতীয় প্রবৃদ্ধিও বাড়বে।

অবশ্যই সব মানুষকে এক ছাঁচে ফেলা যাবে না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, বিভিন্ন বাস্তবতা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। এগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে। তারপরেও সকলের মধ্যে এগিয়ে চলার ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। মানবাধিকার, আইনের শাসন, টেকসই সামাজিক অগ্রগতি এবং সবার জন্য কাঙ্ক্ষিত আঙ্গিকে অগ্রগতির সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করলেই তা সম্ভব হবে। এককথায় বলা যায়, 'বহুতে এক' এই মূলনীতি হবে তৃতীয় স্তম্ভ। এখানেও মূল দায়িত্ব সরকারেরই।

উপর্যুক্ত তিনটি মূলনীতির বাস্তবায়ন ঘটতে পারে একমাত্র অংশীদারিত্বভিত্তিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ ধরনের গণতন্ত্র সমাজের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা স্থানীয় পর্যায়েই মানুষ বসবাস ও কাজকর্ম করে থাকেন। স্বশাসিত স্থানীয় সরকার টেকসই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে জনকল্যাণমুখী স্থানীয় উন্নয়ন জোরদার করে টেকসই স্থানীয় ও জাতীয় অগ্রগতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

৪

এরপর দেশের সামনে বিরাজমান কয়েকটি ঝুঁকি বা সমস্যার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। এই বিষয়গুলো এই সম্মেলনের মূল উপজীব্য "অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন: বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ ঝুঁকিসমূহ"-এর আঙ্গিকেই বিবেচ্য।

এক। কয়েকটি দ্বীপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাদ দিলে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে এখানে বর্তমানে প্রায় এক হাজার মানুষ বাস করছেন। আর অব্যাহত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এক হিসেবে দেখা যায়, বছরে গড়ে ১ দশমিক ৯ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। তবে ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৫ শতাংশ বা তারও কম আর এই হারে বাড়তে থাকলেও বছরে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ মানুষ বিদ্যমান জনসংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে। কাজেই উপকূলীয় অঞ্চল, নদীতীর ও চরসহ ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন এলাকায় অনেক মানুষ বসবাস করতে বাধ্য হন। এছাড়াও আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান এই বিশাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। একদিকে জনসক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ এবং অপরদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

দুই। তারপর যে বিষয়ের দিকে নজর দিতে চাই তা হচ্ছে কৃষি। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির এখনো মূল ভিত। কৃষি (শস্য, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু, মৎস্য, বন) থেকে বর্তমানে আসে জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ তবে জাতীয় কর্মসংস্থানের অর্ধেকেরও বেশি এখনো এখাতেই। তাছাড়া বাংলাদেশের মত একটি মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি নানা ঝুঁকির মুখোমুখি। এমনিতেই বছরে প্রায় ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে

নদীভাঙ্গন ও ভূমির অন্যান্য ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে। প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে পরিমাণ বনাঞ্চল প্রয়োজন তার চেয়ে বিদ্যমান আছে অনেক কম। অনেক নদী-নালা-খাল-বিল কৃষি বা অন্যান্য ব্যবহারের আওতায় নিয়ে নেয়ার কারণে এবং শুষ্কমৌসুমে, বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, পানির স্বল্পতার কারণে মৎস্যখাত সমস্যাসংকুল। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়।

এছাড়াও ভূমি এবং পানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা প্রকটতর হচ্ছে এবং ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশও আক্রান্ত হচ্ছে। এ সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে: ভূমির উর্বরতা (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) হ্রাস; পানির প্রাপ্যতা হ্রাস, বিশেষ করে শুষ্কমৌসুমে; পানি দূষণ; নদী ভরাট, বিশেষ করে সেডিমেন্ট নদীবক্ষে জমা পড়ার কারণে; পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া; লোনা পানির অনুপ্রবেশ; এবং উপকূলীয় এলাকা ও জলার অবনতি। এযাবত কৃষিগবেষণার অবহেলা ও কৃষিখাতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগে অনীহা থাকায় এসকল সংকট মোকাবেলায় কার্যকর সমন্বিত ব্যবস্থা ও কৌশল নির্ধারণ করাই হয়নি, গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রশ্ন অবান্তর থেকে গেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি গবেষণা খাতে ৩৫০ কোটি টাকার একটি স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে যে ৩০-৩৫ কোটি টাকা আয় হবে তা খুবই অপ্রতুল। ভবিষ্যতে কৃষি গবেষণায় অর্থবরাদ্দ অনেক বাড়ানো জরুরি। তবে যাতে এই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগে তা নিশ্চিত করতে হবে।

আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিখাতে সংকট প্রকটতর হবে। অতিবৃষ্টি ও বিধ্বংসী বন্যার ফলে ফসলহানি ও অন্যান্য বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও নদীভাঙ্গন ব্যাপকতর হবে, সমুদ্রস্ফীতির কারণে উপকূলীয় অনেক অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে হারিয়ে যাবে অথবা অব্যবহারযোগ্য লোনাপানির জলায় পরিণত হবে। দেশের ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা বৃদ্ধির কারণে পানি সংকট তীব্রতর হবে। আন্তরাষ্ট্রীয় জলবায়ু সংক্রান্ত প্যানেল (আইপিসিসি)-র ২০০৭-এ গৃহীত চতুর্থ মূল্যায়নে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের রিরূপ প্রভাবে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ কৃষি উৎপাদনশীলতা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে একদিকে কৃষি জমি অনেক কমে যেতে পারে এবং অপরদিকে কৃষি উৎপাদনশীলতা যদি কমে যায় (৩০ শতাংশ না হয়ে ১০-১৫ শতাংশও যদি হয়) তবে আজ থেকে ৩০-৪০ বছর পর এদেশে খাদ্য সংকট ভয়াবহরূপ নিতে পারে। যেমন চলছে তেমনি চলতে থাকলে অর্থাৎ পরিবর্তিত অবস্থার সংগে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা না করতে পারলে মাত্র তিন/চার দশকের মধ্যেই বাংলাদেশ যে ভয়াবহ খাদ্য-উৎপাদন সংকটের মুখোমুখি হবে তা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়।

এছাড়াও সমস্যা রয়েছে কৃষি ব্যবস্থাপনায় এবং ভূমি-জলার মালিকানা ও ব্যবহারে। বিশেষ করে খাস জমি-জলার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে প্রকৃত কৃষক, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক কৃষিখাতেই ব্যাপকভাবে সুযোগ-বঞ্চিত এবং নানা সমস্যার সম্মুখীন। কাজেই কৃষির উন্নয়নে এবং সাথে সাথে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কৃষি-ভূমি-জলার যথাযথ সংস্কারের প্রয়োজন অপরিসীম।

তিন। আগে যেমন ধারণা করা হয়েছিল জলবায়ুপরিবর্তন তার চেয়ে দ্রুত ঘটছে বলে ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সম্প্রতি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী ঘন ঘন ও তীব্রতরভাবে আঘাত হানছে। বাংলাদেশেই ২০০৭ সালে দু'টো বড় বন্যা এবং একটি বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ঘটে গেল।

সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এগুলো ঘটছে তা বলা না গেলেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে এই দূর্যোগগুলোর সম্পৃক্ততা আছে। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামীতে এধরনের বা অধিক তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরো বেশি ঘটবে বলে ধরে নেয়া যায়।

একথা এখন উন্নতবিশ্বসহ সর্বত্রই স্বীকৃত যে, জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে মূলত উন্নত দেশগুলোর দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে বিপুল পরিমাণ গ্রীনহাউজ গ্যাস বায়ুমন্ডলে নি:সরণজনিত কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ুতে কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যই ঘটে তবে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনে যে ধারা, প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও গভীরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা মূলত মনুষ্যসৃষ্ট। আর এর ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে এবং হবে দরিদ্র দেশসমূহ। ভৌগোলিক অবস্থান ও বাস্তবতার কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম।

গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ আজই যদি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তবুও এ শতাব্দী ধরে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া এবং এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্ফীতি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এখনই গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ না নিলে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়া হয়তো নিয়ন্ত্রণে আনা একেবারেই সম্ভব হবে না। তাই উন্নতবিশ্ব বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই এবং উন্নয়নশীল যে কয়েকটি দেশ ক্রমবর্ধমান হারে গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণে উন্নতবিশ্বের অনুসরণ করছে তাদেরকেও গ্রীনহাউজ নি:সরণ নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যকর পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে।

আর বাংলাদেশের মত দেশ যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য উন্নতবিশ্বকে, যার কারণে বাংলাদেশের মত দেশ আজ এই অভিঘাতের মুখোমুখি, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে। অবশ্য বাংলাদেশকেও যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ ও পদক্ষেপ নিতে হবে। অনেক পদক্ষেপের মধ্যে আমি এখানে দুটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করতে চাই। একটি হচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবেলা করার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে দুর্যোগপূর্ব সময়ে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত না হয়ে কার্যকরভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ এবং প্রাথমিক পুনর্বাসন কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় সেজন্য একটি বৃহৎ দুর্যোগমোকাবেলা তহবিল গঠন করতে হবে। একবার এই তহবিল থেকে অর্থ ব্যবহার করা হলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তহবিল পূরণ বা আরো বড় করার ব্যবস্থা করা বঞ্ছনীয়। এই তহবিলে সরকার, বেসরকারি খাত, বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করা যেতে পারে, দাতাদেরকেও এতে বড় অংকের অনুদান দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো যেতে পারে।

চার। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জ্বালানিনিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। বাংলাদেশে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে বিস্তর। আর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রমেও যথাযথ গতিশীলতা নেই। ১৯৯৫ সালে অনুমোদিত জাতীয় জ্বালানিনীতি সংস্কার করে বর্তমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার আলোকে একটি কার্যকর সমন্বিত জ্বালানিনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা জরুরি। জ্বালানির নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য সকল উৎস এবং সকলখাত ও গোষ্ঠীর জ্বালানি ব্যবহারের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত জ্বালানিনীতি প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। সেই আলোকেই জ্বালানির বিভিন্ন

উৎসের ক্ষেত্রে নীতি বিন্যস্ত হতে হবে—যেমন গ্যাসনীতি ও কয়লানীতি।

সম্প্রতি কয়লানীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কয়লানীতি মূল্যায়ন কমিটি (পরবর্তীতে কয়লা-কমিটি) কাজ করছে। এ বিষয়টি জাতীয় জীবনে নানা দিক থেকে আলোচিত হয়েছে, হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত গ্যাস, তেল, কয়লা বিষয়ক নাগরিক কমিশন কয়লানীতির ৭ম খসড়া (আমার জানা মতে এই খসড়াটি কয়লা-কমিটি'র কাজ শুরুর ভিত্তি) বিবেচনা করে সমন্বিত জ্বালানিনীতি প্রণয়নের সুপারিশসহ কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব তৈরি করে উক্ত কমিটির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে, সমন্বিত জ্বালানিনীতির অনুপস্থিতিতেই কয়লানীতি প্রস্তাব করা হচ্ছে।

আমাদের একটি প্রস্তাব ছিল 'কয়লা-বাংলা' বা অন্য কোনো নামে একটি সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে তারই মাধ্যমে যেন কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। জানা গেছে কমিটি এধরনের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ প্রস্তাবিত কয়লানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করছে। এই সংস্থা দেশী-বিদেশী কোম্পানির সহযোগিতায় বা মাধ্যমে কয়লা তোলার ব্যবস্থা করবে।

দ্বিতীয় সুপারিশ ছিল উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা আহরণের ধারণা পরিহার করা কেননা এর ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে এবং বিপুলসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক/অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পরিবেশ এবং বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের যথাযথ পুনর্বাসন সম্ভব নয়। তাই উন্মুক্ত কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। জানা গেছে একটি খনি থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সুপারিশ করছে কয়লা কমিটি। এটি থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটবে তার আলোকে অন্যান্য খনিতে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করার কথা বলা হচ্ছে। প্রথমত এই বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই; তা অপূরণীয় বিপর্যয় ঘটাতে পারে। অন্য যে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা যায় তা হচ্ছে এই খনিটি কোন খনি হবে? ধারণা করা যায় কয়লানীতির এই ধারা এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ি কয়লা খনিতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সুযোগ করে দেয়ার জন্যই মূলত প্রস্তাবিত হচ্ছে। যদি আমার অনুমান সঠিক হয় তবে অতীতে ফুলবাড়িতে যে জনবিস্ফোরণ ঘটেছিল তার আলোকে বলা যায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এটি বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হবে।

জানা গেছে, কয়লাখনির ইজারার বিনিময়ে ৫ শতাংশ (ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে) এবং ৬ শতাংশ (উন্মুক্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে) রয়্যালটি স্থির করার সুপারিশ করা হচ্ছে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়্যালটির হার ছিল ২০ শতাংশ। হঠাৎ করে ১৯৯৪-এর আগস্ট মাসে কোনো গেজেট বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রয়্যালটি ৫ ও ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয় যা ১৯৯৫-এর ডিসেম্বর মাসে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'আইনসিদ্ধ' করা হয়। এই পরিমাণ রয়্যালটির কথা পুনরাবৃত্তি করা হয় ২০০৩ সালের মে মাসে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। বিদেশী কোনো কোম্পানি কোনো খনিতে কয়লা উত্তোলনের মূল দায়িত্বে থাকলে এবং তাই সাধারণত ঘটবে বলে ধরে নেয়া যায়, মুনাফা মূলত উঠবে ঐ কোম্পানির তহবিলে। অর্থাৎ নামমাত্র রয়্যালটির বিনিময়ে কয়লা খনিগুলো ঐ সকল কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা হবে বলে দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারতে কয়লা উত্তোলনে রয়্যালটির হার ১৪-১৭ শতাংশ।

কোকিং কয়লা রপ্তানি করা যাবে বলে সুপারিশ করা হচ্ছে। উচ্চমানের এই কয়লা ফুলবাড়ি খনি থেকে উত্তোলনযোগ্য কয়লার আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ বা ৮৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন বলে ধরা হয়েছে। দেশে

জ্বালানি-চাহিদার আলোকে কোনো কয়লা রপ্তানি করার সুযোগ নেই একথা জ্বালানি নীতির ৭ম খসড়ায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে পিছু হাটা হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে। এতে কয়লা রপ্তানির জন্য একটি জানালা খোলা হবে, পরে এর রপ্তানি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় বর্তমানে কয়লা রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই বলে ৭ম খসড়ায় যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা-ই সঠিক বলে আমি মনে করি।

উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো (যদি করা হয়) জাতীয় স্বার্থের নিরিখে প্রশ্নবিদ্ধ। কয়লা-কমিটির প্রস্তাবিত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো ধারা সম্বলিত কয়লানীতি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণ করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কয়লা-কমিটির সুপারিশকৃত কয়লানীতি নিয়ে সরকার অগ্রসর হতে চাইলে তার ওপর ব্যাপক জনমত যাচাই করার ব্যবস্থা নেয়াই হবে যথাযথ পদক্ষেপ।

পাঁচ। আরো একটি বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে মানব সক্ষমতা। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে মানব-সক্ষমতায় বিভিন্ন মাত্রার ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যারা বাংলাদেশের পক্ষে দেনদরবার করেন, বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন সেখানেও ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতি রয়েছে প্রশাসনে, রাজনীতিতে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। সাধারণ মানুষ অবশ্য এক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। মানব-সক্ষমতায় বিরাজমান নানা ধরনের এবং মাত্রার ঘাটতির মূল কারণ যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পারিপার্শ্বিকতা, কার্যপদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং অঙ্গীকারে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার ঘাটতি।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার হার সরকারি হিসাবে ৬৪ শতাংশ তবে তা ৪৩-৪৫ শতাংশ বলে বেসরকারি গবেষণায় দেখা যায়। অনুপাত যাই হোক তার অর্ধেক বা তারও বেশি শুধু নাম লিখতে জানেন, তার বেশি কিছু নয়। কাজেই কার্যকর প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিতের হার এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ হতে পারে। তার উপর রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষায় সংকট। কী সরকারি পর্যায়ে কী বেসরকারি পর্যায়ে এ সকল বিষয় নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করি। তবে অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ব্যবস্থা বদলানোর কার্যক্রম কোনো গতিই পাচ্ছে না দেখা যায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়সমূহের শিক্ষার ভিত্তি-ভূমি। সরকারি, পারিবারিক ও অন্যান্য বেসরকারি খরচ মিলিয়ে জাতীয় আয়ের মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে এই অনুপাত বেশি। নেপালে তা ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এছাড়া প্রাথমিক, মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (যথা-সরকারি, বেসরকারি রেজিস্ট্রিকৃত, বেসরকারি রেজিস্ট্রিকৃত নয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) মধ্যে সরকারি আর্থিক সমর্থনে প্রকট বৈষম্য রয়েছে। আবার প্রাথমিক পর্যায়ে (সবপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এক সঙ্গে বিবেচনায় নিলে) দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীর মাথাপিছু মোট বার্ষিক গড় খরচের প্রায় ৭২ শতাংশ শহরাঞ্চলে এবং ৬৪ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক উৎস থেকে আসে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 'নিখরচায় প্রাথমিক শিক্ষার' যে কথা বলা হচ্ছে তা শুধুই বুলিসর্বস্ব। দরিদ্র পরিবারগুলো এ খরচ বহন করতে পারে না বলে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় অগ্রসর হতে পারে না। তারা সাধারণত যে সকল স্কুলে যায় সেগুলোই সরকারি অনুদান কম পায় বা পায় না এবং এসকল বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের সংকট ব্যাপক। কাজেই তাদের শিক্ষার মানে যে বিশাল ঘাটতি থাকবে তা বলাই বাহুল্য। এই বাস্তবতাগুলো বিবেচনায় নিলে বলা যায় যে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা বাংলাদেশে প্রশ্নবিদ্ধ আর মানসম্পন্ন

শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রশ্নবিদ্ধ। এই তথ্যগুলো এডুকেশন ওয়াচ (Education Watch) রিপোর্ট ২০০৬ থেকে সংকলিত। রিপোর্টে আরও বিস্তারিত তথ্য ও বিশ্লেষণ রয়েছে। সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সকল শ্রেণীর, বিশেষ করে দরিদ্র পিছিয়েপড়া পরিবার সমূহের ছেলে-মেয়েদেরকে বিবেচনায় নিয়ে সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা জরুরি।

ছয়। সবশেষে, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সম্বন্ধে কিছু কথা। তারা প্রচুর অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এর বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪০ হাজার কোটির ওপর পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ৯ শতাংশ বা তারও বেশি। বিভিন্ন সময়ে কিছু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নেয়া হলেও এই অর্থের উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যথাযথ পরিবেশ ও উৎসাহ-কাঠামো সৃষ্টি করা হয়নি। কাজেই এই অর্থের অধিকাংশই জমি ক্রয়, বাড়িঘর বানানো, বিলাস দ্রব্যাদি ক্রয়, মামলা-মোকাদ্দমা চালানো, নানা ধরনের উৎসব পালন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হয়েছে, হচ্ছে। যে সমস্ত এলাকা থেকে অনেক মানুষ বিদেশে কাজ করছেন এবং দেশে অর্থ পাঠাচ্ছেন সে সমস্ত এলাকার কোথাও কোথাও স্থানীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি প্রকট আকার ধারণ করতে দেখা যায়। ভোগান্তি হয় এলাকার অন্যান্য মানুষের। বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ ক্ষুদ্রশিল্প, ব্যবসায় ও গ্রামীণ অকৃষিখাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা গেলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, বিশেষ করে অদক্ষ, স্বল্পদক্ষ, পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য। এসকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার্ষিক হিসাবে বৈদেশিক সাহায্য যা পাওয়া যাচ্ছে তা বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের এক-চতুর্থাংশেরও কম—১ দশমিক ৩ থেকে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ একহাজার কোটি বা তারও কম। আর এর প্রায় অর্ধেক আবার বৈদেশিক দেনা শোধে চলে যায়। নিট পরিমাণ তাই দাঁড়ায় মাত্র পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ কোটি টাকায় যা বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের মাত্র ১২-১৩ শতাংশের মত। একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়, এতো অর্থ যারা দেশে পাঠান সেই বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা আমাদের দূতাবাসগুলো থেকে সাধারণত সহায়তা পান না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং লাঞ্ছিত হন বলে জানা যায়। আবার তারা যখন দেশে আসেন তখন নিজ দেশের বিমান বন্দরে অনেককে অসহনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, ভোগ করতে হয় লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যাবহার। শুধু দেশে টাকা পাঠান বলেই নয়, এদেশের নাগরিক হিসেবেও তারা মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। তারা যেন যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পান এবং অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুখোমুখি না হন তা নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে বলতে চাই, জ্ঞান-ভিত্তিক বিকাশের এবং বিশ্বায়নের এই যুগে দুনিয়া যেখানে এগিয়ে চলছে আমরা সেখানে পিছিয়ে থাকতে পারি না। কাজেই এই বৈশ্বিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের অর্থনীতি, সমাজ এবং রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে। তবে তা হতেই হবে দেশের সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে, কাউকে বাদ দিয়ে নয়। আর আমাদের অগ্রগতির পথ আমাদেরকেই নিরূপণ করতে হবে।